4 JUN. 2003
পৃঃ ... ২১ ... কলাম ... ১ ......

দৈনিক
ইনকিলাব

গবেষণা

উচ্চশিক্ষার উচ্চ শিখর

মাহমুদ শাহ কোরেশী

উচ্চশিক্ষা বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি গ্রাজুয়েট বা মাস্টার্স পর্বের পাঠক্রমকে। কিন্তু অতঃকিম? তারপর কী? তারপরও আছে বহু কিছু : বিভিন্ন সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি- বিশেষ করে বর্তমানে যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি জনপ্রিয় দুটো ডিগ্রি 'এমফিল এবং ডক্টরেট'। এমফিল না হয়ে অন্য একটা 'মাস্টার্স'ও হতে পারে। ডক্টরেটও আবার এক ধরনের নয়- ডি ফিল, ডিলিট/ডিএসসি কিংবা বহুল পরিচিত পিএইচডি। পৃথিবীর বহু দেশে এগুলো আরো বিভিন্ন নামে বা আদ্যাক্ষরে পরিচিত। আপাতত সেসব দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপনের কিংবা মূল্যায়নের সমতা বিধানে অবকাশ অকুস্থলে নেই। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য রয়েছে ইউনেস্কো এবং বিশ্বের তাবৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'সার্ভিস অব ইকোয়েভালেন্স' বিভাগ।

এখন সবচে' বড় গলায় বলার বিষয় যা তা হল, উপর্যুক্ত এমফিল এবং ডক্টরেট ডিগ্রিসমূহ হল গবেষণা-ডিগ্রী। উপযুক্ত মৌলিক গবেষণার ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রদত্ত হয় এইসব ডিগ্রি। বলাবাহুল্য, গবেষণার সূত্রপাত পূর্বাহ্নে হতে পারে। যেমন, মাস্টার্সের এক পত্রের বদলে একটি 'গবেষণাপত্র' প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি শৃঙ্খলায়। কোথাও মাস্টার্সের পুরো কোর্সটাই একটা থিসিসে দেয়ার নিয়ম আছে। কোথাওবা বিএ লেভেলেও গবেষণাপত্র রচনার রীতি রয়েছে। সাংবাদিক, সাহিত্যকর্মী বা সমাজবিজ্ঞানীর মত অনুসন্ধিৎসুরাও ঘটনাচক্রে বা প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়ে পড়েন গবেষণাকর্মে এবং একটা বড় পাঠকগোষ্ঠীর জন্য রেখে যান মূল্যবান পাঠ্যবস্তু। এখানে একটা কথা না বলে পারা গেল না। আমাদের দেশে প্রায়শই সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় বা লেখা হয়, রচনাটি 'গবেষণামূলক' কিংবা গবেষণাধর্মী, এ ধরনের মন্তব্য আসলে অযথার্থ। কেননা, রচনাটি হয় গবেষণাকর্ম। ১. গ্রন্থটিরভেদ যথরূপ হবে অথবা হবে না। না হয়ে থাকলে কেন হলো না তার উল্লেখ/বিশ্লেষণ থাকবে। মাঝামাঝি কিছু হতে পারে না। যাহোক, আমাদের মূল লক্ষ্য, প্রাতিষ্ঠানিক পর্বে গবেষণাকর্মের স্থান নির্ণয়। উচ্চশিক্ষার শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের পর আমরা কাউকে কোন বিষয়ে মোটামুটি দখল অর্জন করেছে বলে মনে করে থাকি। কিন্তু তারপরও থাকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানলাভের অভিপ্রায় ও প্রয়োজন। এজন্য অনেকের বিশেষ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত, তাঁরা একটি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভকে জীবনের চূড়ান্ত অভিষ্টরূপে বিবেচনা করে থাকেন। আক্ষেপের দিনে বা এখনও, কখনো কখনো সরাসরি সেটি সম্ভবপর হয়ে থাকে। গবেষণার পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকলে, রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকলে, দীর্ঘ শিক্ষকতার রেকর্ড থাকলে, কেউ কেউ ডক্টরেট ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। নতুবা একজন প্রার্থীকে প্রথমে এমফিল কোর্সে ভর্তি হতে হয়। অভিজ্ঞতা সূত্রে বলা যায় যে, এমফিল কোর্সে প্রার্থীর ওপর চাপটা পড়ে অনেক বেশী। তাঁকে অনেকগুলো কোর্স করতে হয়, পরীক্ষা পাস করতে হয় এবং ক্ষেত্র গবেষণায় যুক্ত থাকতে হয় এবং পরে গবেষণা গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়। ডক্টরেট ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির সুবাদে পূর্বঅভিজ্ঞতার কারণে প্রার্থী কিছুটা এগিয়ে এসে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তবে তাকে, যাকে বলা হয়, পাথর ঘাটুনী খেটে যেতে হয়। কেননা, তাঁর নির্বাচিত ক্ষেত্রের কোন উপাদানকেই তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। সবকিছু খুঁজে বের করতে হয়। ভালমন্দ বিচার করতে হয়, নির্বাচিত তথ্যকে সাজাতে হয়। উপযুক্ত বিশ্লেষণের পর একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনাকর্মে এগোতে হয়। তবে বলাবাহুল্য তৎপূর্বে তাঁকে গবেষণার উপযুক্তরূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে হয়। একটা ভাল প্রকল্প তৈরী করতে এবং প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ধীরেসুস্থে কাজে নামতে হয়।

একাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। কোন কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কও হয়ত ছাত্রের কাছ থেকে বা ছাত্রের ভুল সিদ্ধান্ত থেকেও শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে গবেষকের চিন্তা-ভাবনা ও রচনার প্রতিটি স্তরের প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর দিতে হয়। নতুবা ভুলভ্রান্তি, অসঙ্গতির অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়বে। সোজা কথা, তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন গবেষকের জন্য একজন গুরু। যেমন বাউল সম্প্রদায়ের গুরু। গবেষণাকালে প্রার্থীকে গুরুর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় পুরোপুরি। তবে এক্ষেত্রে গুরুর সদুপদেশ বা নির্দেশ নয়, কখনো কখনো হয়ত ভিন্ন পথ অবলম্বন করা যায়, বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া যায়। তবে গুরুকে হতে হবে সৎগুরু। গুরুর কারণে অনেকের গবেষণাকর্মের ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি ঘটে না বা ডিগ্রি লাভ সম্ভব হয়নি- এমন দৃষ্টান্তও খুব কম নয়।

এমফিলের জন্য সাধারণত দু'বছর এবং পিএইচডি'র জন্য তিন বছর বরাদ্দ। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক বেশী সময় পরে সম্ভবপর হয়ে থাকে ডিগ্রি লাভ।

আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক গবেষণাকর্মের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু লেকচারশীপ বা ফেলোশীপ (গবেষণা বৃত্তি) প্রবর্তিত হয় এবং এভাবে অর্জিত হয় অনেক মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। সৈয়দ আমীর আলী, দীনেশচন্দ্র সেন ও শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর প্রকাশিত সন্দর্ভের উল্লেখ এখানে বাহুল্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ আমলের তিন দশকে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার কাজে বেশী ব্যস্ত ছিল। তবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, শুধু প্রাচ্য সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে বহু অবদান রাখার গৌরবে মহিমান্বিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাছাড়া ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, হিস্টরি অব বেঙ্গল প্রভৃতির প্রকাশনাও পূর্বসূরীদের গবেষণা মনস্কতার স্মারক। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটল নানা দিক দিয়ে। বহুবিধ সঙ্কটের মধ্যেও অল্পদিনে উচ্চতর ডিগ্রির সন্ধানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলে দলে ছুটলেন এ্যাংলো-আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। ডক্টরেট ডিগ্রির মুকুট পরে ফিরলেন কেউ কেউ। রাজশাহীতে চালু হল নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩)। ঢাকা-রাজশাহীতে বিবিধ বিষয়ে-বিশেষ করে সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার গোড়াপত্তন উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ষাটের দশকের মধ্যেই আমরা বেশ ক'টি পিএইচডি পেয়ে গেলাম। কয়েকটি অনন্য ব্যক্তিগত প্রয়াসও এই সময়কালের বৈশিষ্ট্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই, (সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান) ডক্টর এ এইচ দানী (ইতিহাস), ডক্টর নাজমুল করিম (সমাজবিজ্ঞান), অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (তুলনামূলক সাহিত্য) প্রমুখের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

সত্তর-আশি-নব্বই এই তিন দশকের কাল পরিক্রমা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটল নতুন চিন্তা-চেতনা ও নানা স্বপ্ন-সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, আবিষ্কার ত্বরান্বিত ঘটনা বহুল বিংশ শতাব্দীর অবসানলগ্ন এলো এগিয়ে। একুশ শতক, তৃতীয় সহস্রাব্দ আর বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের শিক্ষা জগতেও কিছু পরিবর্তন ঘটবে না তা কি সম্ভব? বস্তুত বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। আলমন্দ বহু কিছুর হিসেব-নিকেশ ভুলে আমরা যদি অর্জনের দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে গবেষণার বহু ব্যাপকতা, সূক্ষ্ম অনুসরণে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অবশ্যই আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিক মানের কাজকর্ম দেশে ও দেশের বাইরে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি। আমাদের শিক্ষাবিদরা অতি সচেতনভাবে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা ভেবেছেন এবং বহু বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে অবকাঠামো নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই আমরা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক একটি 'ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। নির্ধারিত বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা ঘটানোই ছিল এগুলোর কাজ। দুর্ভাগ্যবশত, সবক্ষেত্রে তা হয়ত হয়নি, প্রয়াসই শুরু হয়েছিল কিনা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তবে কখনো কখনো, কোথাও কোথাও গবেষণার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা ছিল এদেশে অকল্পনীয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (১৯৭৪) একদা এমনি পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে আত্মপরিচিতি সচেতন হয়ে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, আইন, ব্যবসায়বিদ্যা এবং পরীক্ষণাগার নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বিষয়ে এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রিসহ মুক্ত গবেষণার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল না, পরেও হয়নি। এ যাবৎ 'সোনালী' ডিগ্রিধারী এবং বহু গবেষকের রচনা এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে বা পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে রয়েছে। বাংলার আদ্যোপান্ত ইতিহাস, গ্রাম, ভূপ্রকৃতি, সম্পদ ইত্যাকার সমস্যাদি নিয়ে সমন্বিত অধ্যয়ন, গবেষণা ও পর্যালোচনার পরিবেশ সৃষ্টি এই ইনস্টিটিউটের (যা অন্যাক্ষরে আইবিএস নামে বিখ্যাত) সামগ্রিক সাফল্য। বলাবাহুল্য, ইতোমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবিধ ক্ষেত্রেও গবেষণার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে।

গবেষণার মূল লক্ষ্য যা- অর্থাৎ বিষয় বিশেষের তত্ত্বান্বেষণ' (বঙ্গীয় শব্দকোষ) এবং তার নির্মোহ উপস্থাপনা- তাই সংক্ষেপে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে ওঠে।

এখানে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সর্বশ্রেণীর শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বিষয়টিও যুক্ত হতে পারে। নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য নতুনতর উপাদান সংগ্রহ করতে হবে যাতে যুগের প্রয়োজনে অগ্রসর ও সমুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা খ্যাতি পায়।

গবেষণা তাই উচ্চশিক্ষার উচ্চশিখর। কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করবে জ্ঞানের, জ্ঞান আহরণ, বিতরণ ও বিনিময়ই মূল লক্ষ্য। কিন্তু জ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন ও পরিমার্জিত রূপ উপস্থাপন কেবলমাত্র গবেষণার ফলেই সম্ভব।

লেখক : গবেষক, সাবেক প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী